ময়মনসিংহের ইব্রাহীম সরকার

লেবু চাষে লাখপতি

অনুসন্ধান করেছেন **সাইফুল হাসান**

ব্রিটিশ আমলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। বাড়ির কাছাকাছি কোনো স্কুল না থাকায় পড়াশোনা হয়নি তার। শিক্ষা না থাকলেও শখের অভাব নেই। বাবার একমাত্র সন্তান হওয়ায় প্রায় শখই তার পূরণ হতো। এখন বয়স ৭৪। এই বয়সেও তিনি একটানা ৯ মাইল দৌড়াতে পারেন। দৃষ্টি প্রখর। সোজা হয়ে হাঁটেন। মুখে সব সময় হাসি লেগে আছে। এই হচ্ছেন ইব্রাহীম সরকার। ময়মনসিংহের সদর থানার রঘুরামপুর গ্রামে তার বাস। এই গ্রামটি অন্য দশটি গ্রামের মতোই।

সারা জীবন ফুটবল, গান, যাত্রা, নাটক নিয়ে কেটেছে। এই বয়সেও অবসর পেলেই যাত্রা-নাটক নিয়ে পড়েন। গ্রামবাসী কোনো দিনই এই ছেলেটির মাঝে কোনো সম্ভাবনা দেখেনি। ছোটবেলাতেই ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় ফুটবল খেলে নাম করেছেন। খাওয়া-পরার চিন্তা ছিল না বলে সবাই ধরেই নিয়েছিল স্বচ্ছল পিতার উচ্ছন্নে যাওয়া পুত্র। সেই ইব্রাহীম সরকার আজ বিখ্যাত মানুষ। সারা দেশের লোক তার বাড়িতে আসে। শুধু দেশীই নয় বিদেশী রাষ্ট্রদূত, সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও এই লোকটির বাড়িতে নিয়মিত পদধূলি দেন। ব্যাপারটা গ্রামবাসীকেও অবাক করে। কিন্তু ঘটনা সত্য। কারণ কি? একজন সাধারণ মানুষের বাড়িতে এত বড় সব লোকের আনাগোনা কেন? কি এমন করেছেন?

তার বাড়িতে যাবার আগে কোনো ধারণাই ছিলো না তিনি কতোটা সুখ্যাত। তার বাড়ি থেকে ৭-৮ কি.মি. দূরে এক রিকশাচালককে রঘুরামপুর গ্রামের দূরত্ব জানতে চাইলে বলেন, কার বাড়িতে যাইবেন। সরকার সাহেবের বাড়ি? ইমান আলী একেবারে তার উঠানে নিয়ে রিকশা থামালেন। ইব্রাহীম সরকার বাড়িতে নেই। সুতরাং তার জন্য অপেক্ষা। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে ফিরলেন। ইতিমধ্যে খবর পেয়েছেন ঢাকা থেকে দু'জন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমাদের সামনে এসে হেসে ফেললেন। কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'কি করবো। বাড়ির বাইরে গেলে অন্যরা

তাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। ভালোবাসে, সম্মান করে। না যেয়েও পারি না। আমি দুঃখিত অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখতে হলো বলে' -এভাবেই শুরু ইব্রাহীম সরকারের সাথে আলাপ।

লোকটি বিখ্যাত হয়েছেন চাষ করে। লেবুর চাষ। তার প্রজেক্ট দেখতে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসে। ফেরার সময় একটি খাতায় আগতরা মন্তব্য লিখে যান। কয়েকটি বড় খাতা বিশিষ্ট লোকদের মন্তব্যে ভরে গেছে। অবসরে এসব মন্তব্য পড়ে তিনি আনন্দ পান। যদিও তেমন অবসর তিনি পান না। লেবু চাষ তাকে খ্যাতি এনে দিয়েছে। সম্মান দিয়েছে। শুধু চাষ করেই প্রচুর লোকের ভালোবাসা পেয়েছেন। ইব্রাহীম সরকারের জীবন সার্থক। তিনি বলেন, আর কি চাই জীবনে? আমার মতো মানুষের ছবি পত্রিকায় আসে, আমার কথা লোকজন মন দিয়ে শোনে, গ্রামবাসী ভালোবাসে। শুধু লেবুর চাষ করে আমি সবার নয়নের মণি।' তো একজন কৃষকের জীবনে আর কিইবা চাওয়ার থাকতে পারে?

বাবা মরার পর মা, মা মরার পর বউই সংসার চালিয়ে নিতো। সুতরাং লেবু চাষে সংসার চালানোর চিন্তা করিনি। কিন্তু ধানি জমিতে লেবুর বাগান করায় হয়তো বাড়ির কেউ কষ্ট পেয়েছিলো। কিন্তু খেয়ালি মানুষ বলে কেউ কিছু বলেনি। আমি আমার মতো সামনে চলেছি

ফুটবলার থেকে লেবু চাষী

বাবার একমাত্র সন্তান হওয়ায় জীবিকার চিন্তা করতে হয়নি। ছোটবেলায় ফুটবল তাকে পেয়ে বসে। একমাত্র সন্তান হওয়ায় বাবা-মায়ের দুর্বলতা ছিল। বাবা কোনো দিন ছেলের কাজে বাধা দেননি। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার আজ এখানে তো কাল ওখানে করে বেড়িয়েছেন। সংসার তাকে কখনও টানেনি। এখনও টানে না। যতোটা টানে যাত্রার মঞ্চ বা খেলার মাঠ। একটানা ১৭ বছর ফুটবল খেলেন তিনি। তারপর ওস্তাদ হেমেন্দ্র চন্দ্রের নির্দেশে খেলা বন্ধ করেন। একটানা ৪৩ বছর রেফারিং করেছেন। ইচ্ছে ছিল ফুটবলার হবেন। বিখ্যাত ফুটবলার। দেশের সবাই তাকে এক নামে চিনবে। কিন্তু কোচের নির্দেশে খেলা ছাড়তে হলেও ফুটবল ছাড়েননি। বাংলা ১৩৬২ সালে বিয়ে করেন তিনি। ছেলের উড়নচন্ডীপনা ছাড়াতেই বাবা-মা তাকে বিয়ে করান। তিনি বলেন, 'বিয়ে করার পর নতুন বউ পড়ে থেকেছে; আমি খেলাধুলা, যাত্রা, নাটক নিয়ে থেকেছি। আমার মা এক হাতে সব সামাল দিয়েছেন। কোনো চিন্তা করতে হয়নি। বাবা মারা যাবার পরও একই অবস্থা। মা-ই সব দেখেছেন। আমার কিছু করতে হয়নি।'

ফুটবল খেলে বিখ্যাত হতে না পারলেও তার দুঃখ নেই। কারণ চাষ করে সেই নাম তিনি অর্জন করেছেন। বাবা মারা যাবার পর

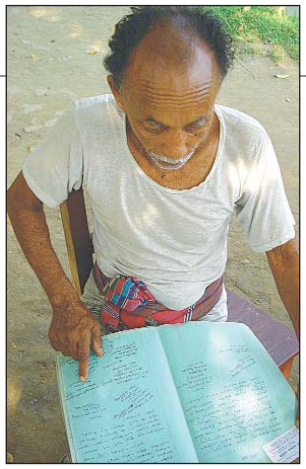

সম্পত্তি নিয়ে মামলায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। এখনও তার জীবনে ফুটবলের ভাটা পড়েনি। জীবন বাঁচাতে পৈতৃক সম্পত্তি সব বিক্রি করে দিতে থাকলেন। দারিদ্র্যও আস্তে আস্তে বাসা বাঁধতে শুরু করে। ইব্রাহীম সরকারও কিছুটা মনোযোগী হন সংসারে। তার ভাষায়, ‘এটা মনোযোগ নয়। বাপের সম্পত্তি রক্ষা করার চেষ্টা মাত্র। সব বিক্রি করে জমির পরিমাণ ৩ একরে দাঁড়ালো। তাও আমি ভবিষ্যতের কথা ভাবিনি। বুঝেছি রিজিকের মালিক আল্লাহ। আল্লাহই পথ দেখাবেন।’

বিদেশীরাও আসছে। আমার এই সাফল্য তো সারা দেশের মানুষের। প্রচুর বাগান করতে পারলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে লেবু বিদেশেও পাঠাতে পারবো। বিদেশী অর্থ আসবে। সুতরাং সব কৃষকের লেবুর চাষ করা উচিত। বিদেশীরা আমাকে বলেছে তাদের দেশে লেবুর প্রচুর চাহিদা। তাছাড়া এত সুন্দর লেবু সোনার বাংলা ছাড়া আর কোথায় হবে

এভাবে চলতে চলতেই ’৯৪ সালে তিনি লেবু গাছ লাগান। ’৯৫ সাল থেকে পুরোপুরি লেবু চাষে আত্মনিয়োগ করেন। -এককালের কৃতী ফুটবলার হয়ে গেলেন লেবু চাষী।

শখের চাষে বড়লোক

কোনো দিন ভাবেননি কৃষি কাজ করে খেতে হবে। নিয়তি তাকে কৃষি কাজেই টেনে এনেছে। কিন্তু এখন একটি ফসল তিনি বেছে নিয়েছেন, যাতে অধিক অর্থ আর সময় ব্যয় করতে না হয়। কিন্তু তার লাভে জীবন নিরাপদেই কাটবে। সত্যিকারের চাষী হবার আগে তিনি শখের বশে একটি লেবু গাছ রোপণ করেন। এই শখের গাছটি পরবর্তীতে তার জীবন বদলে দেয়। কিভাবে? তার উত্তর দিলেন ইব্রাহীম সরকার। ‘ছোটবেলায় বিয়ে করায় অল্প বয়সেই বাবা হয়েছি। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। পাকিস্তান আমলে মেয়েদের বিয়ে হয়েছে। তো আমার এক মেয়ে থাকতো রাজারবাগ পুলিশ লাইনে। তখনকার দিনে রাস্তাঘাট ভালো ছিলো না। তো একবার ঢাকায় যাবো। অনির্দিষ্টকালের জন্য ট্রেন ধর্মঘট। তখন ঢাকা যেতে হতো টাঙ্গাইল হয়ে। ফেরার পথে টাঙ্গাইলের কাছে বাসের টায়ার পাংচার হয়ে গেলো। ড্রাইভার আমাদের বললো ঘণ্টা তিনেক দেরি হবে। আমি আশপাশে ঘুরছি। হঠাৎ দেখি একজন লোক অগ্নিশ্বর, মাল্টা আর দেশী লেবুর চারা বিক্রি করছে। শৌখিন মানুষ আমি। চারা বিক্রেতার কাছে দাম জানতে চাইলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে কলার চারা ৫ টাকা মাল্টা ১২০ টাকা, লেবুর চারা ৮০ টাকা চাইলো। আমি তার কাছ থেকে লেবুর চারা নিতে চাইলাম। সে কোনোভাবেই ৮০ টাকার নিচে দেবে না। চারা বিক্রেতাকে বললাম, ভাই আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। কিছু কম দামে দেন। অনেক দরাদরির পর ৬০ টাকায় লেবুর চারা নিলাম। বারোমাসী দেশী লেবুর চারা। বাড়ি এসে গাছ লাগালাম। এক বছরের মাথায় লেবু এলো। বাড়িতে আর দশটা গাছের মতো অনাদরে-অবহেলায় লেবু গাছটা বড় হলো। প্রচুর লেবু আসতো গাছটাতে। মাত্র আট বছর আগে এই লেবু গাছটাই আমার জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে।’

মেয়ের বাসায় যাবার সময় বাড়ির শাকসবজি, দু’চারটে লেবু বা অন্য কোনো ফলমূল নিয়ে যেতেনই। তো ’৯৪ সালে মেয়ের বাসায় যাচ্ছেন সঙ্গে দু’হালি লেবু নিয়ে। মালিবাগ নামার পর মনে হলো তিনি দুটো লেবু বিক্রি করে দেবেন। তো মালিবাগ নেমে পায়ের কাছে দুটো লেবু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। মাথা চুলকাচ্ছেন। কারণ এমন ঘটনা তার জীবনে প্রথম। একজন এসে লেবুর দাম জিজ্ঞেস করলে তিনি ২০ টাকা চান। অনেক দর কষাকষির পর ১৬ টাকায় বিক্রি করেন। লেবু বিক্রি করে অর্থ পাবার পর তার মাথায় আসে এভাবে তো আয় করা যায়। পকেটে ১৬ টাকা নিয়ে মনের আনন্দে মেয়ের বাসায় গেলেন। দরজা খুললো নাতি ফিরোজ আহম্মেদ। নাতি ছেলে ইব্রাহীম সরকারের কাছে জানতে চায় লেবু এনেছে কি না? তখন নাতি ছেলে তাকে বলে নানা তুমি লেবুর চাষ করতে পারো। আমি আজও ফকিরেরপুল বাজার থেকে বিদেশী লেবু কিনে এনেছি ৩৮ টাকা হালি। নাতির এই কথাটি তাকে আরও উৎসাহিত করে।

বাড়ি ফিরেই তিনি পুরনো গাছটি থেকে ২৩টি কলম করেন। তারপর বাড়ির চারপাশ দিয়ে লাগিয়ে দেন। এক বছরের মাথায় লেবু আসা শুরু করে। তখনও ব্যাপারটিকে বাণিজ্যিকভাবে ভাবছেন না। তিনি বলেন, ‘যা করতে ভালো লাগে তাই করি। সংসারের প্রতি খেয়াল না থাকায় নিজের শখ নিয়েই থাকতাম। প্রথম ২৩টা গাছও লাগালাম শখের বসে। এ সময় এই এলাকার কৃষি অফিসের ব্লক সুপার ভাইজার আব্দুল আজিজের নজরে পড়ে গেলাম। ’৯৫ সালের শেষ দিকে হবে। তিনি আমাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। আমি কোমর বেঁধে নেমে পড়লাম বাগানের কাজে।’

আজিজুর রহমানের উৎসাহ ইব্রাহীম সরকারের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এলো। পুরো ’৯৬ সাল তিনি বাগান করে যাচ্ছেন। এই প্রজেক্ট করলে কতোটা লাভ হবে সে ধরনের কোনো হিসাব-নিকাশও করেননি। অন্যদিকে লেবু হলে বাজারজাত হবে কিভাবে সে সম্পর্কেও তার ধারণা নেই। এক কথায় কোনো ভবিষ্যৎ না ভেবে, এক রকম ঝুঁকি নিয়ে তিনি ধানি জমিগুলোতে লেবুর আবাদ শুরু করলেন। এভাবে ’৯৬-এর মধ্যে প্রায় ৩ একর জমি আবাদ করে ফেলেছেন। বাড়ির সামনের ২৫ শতাংশ জমিতে লাগানো গাছে ’৯৬-এ প্রচুর লেবু হলো। লেবু শম্ভুগঞ্জ বাজারে নেবার পর যে অভিজ্ঞতা হলো তা যে কারো জন্যই দুঃস্বপ্নের কারণ। সাপ্তাহিক ২০০০কে এই সময় সম্পর্কে বলেন, ‘শম্ভুগঞ্জ বাজারে লেবু নিলাম। কেউ কেনা তো দূরের কথা, জিজ্ঞাসাও করে না। ফলে কি আর করবো, মানুষজনকে বিলিয়ে দিলাম। তাই বলে মন খারাপ হলো তা নয়। আগেই বলেছি, শৌখিন মানুষ শখের বশেই বাগান করা। তাই শুধু কলম বানানো আর গাছ লাগাতে লাগলাম। বাবা মরার পর মা, মা মরার পর বউই সংসার চালিয়ে নিতো। সুতরাং লেবু চাষে সংসার চালানোর চিন্তা করিনি। কিন্তু ধানি জমিতে লেবুর বাগান করায় হয়তো বাড়ির কেউ কষ্ট পেয়েছিলো। কিন্তু খেয়ালি মানুষ বলে কেউ কিছু বলেনি। আমি আমার মতো সামনে চলেছি।’

শম্ভুগঞ্জে বিক্রি না হওয়ায় তিনি ময়মনসিংহ শহরে লেবু নিতে থাকলেন। সেখানে বিক্রি হলো। ’৯৭ সালে তার লাভ হলো ৫০ হাজার টাকা। সেই থেকে শুরু। তারপর থেকে শুধু লাভের টাকা ঘরেই আসছে। নতুন বিনিয়োগ আর তেমন লাগছে না। ৬০ টাকার এক লেবুর চারা আজ তাকে লাখপতি করেছে। ৭ জন শ্রমিক ১২ মাস তার বাড়িতে কাজ করে। যাদের বেতন দিতে হয় প্রায় ২০ হাজার টাকা। গ্রামে যে লোক মাসে ৭ জন লোককে মোটামুটি সম্মানজনক বেতনে সারা বছর কাজ করায়, তার মাসিক আয় কত তা কি সহজেই অনুমেয় নয়?

সফল মানুষ ইব্রাহীম সরকার

সন্দেহ নেই যে, সফলতার শীর্ষে পৌঁছেছেন তিনি। কিন্তু সাফল্য আসার আগেও তার অবস্থা (মানসিক) একই ছিল। শম্ভুগঞ্জে তার লেবু বিক্রি না হওয়ার পরও তিনি মানসিক বল হারাননি। এতো মানসিক শক্তি তিনি কোথায় পেলেন? উত্তরে বলেন, 'আমি কোনো দিন কারও ক্ষতি করিনি। তাই ভরসা ছিল আল্লাহ মুখ তুলে তাকাবেন। বরং কেউ কেউ আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে। তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া লাভ-ক্ষতির হিসাব করে তো বাগান করিনি। তাই ওটা নিয়ে চিন্তাও ছিলো না।'

'৯৭ সালের মধ্যে তার এ একরের বাগান যখন পরিপূর্ণ তখন তিনি এর ভবিষ্যৎ দেখতে পেলেন। এর মধ্যে সরকারের কৃষি অফিসার, জেলা কৃষি অফিসার, কৃষি অধিদপ্তরের ডিজি '৯৬-এর শেষে তার বাগান ঘুরে গেছেন। বাংলাদেশে ব্যতিক্রমী এমন কৃষক দেখতে

পেয়ে তারাও খুশি। তাই শুধু উৎসাহ দিয়ে যেতে লাগলেন। প্রজেক্ট করতে তার উদ্বৃত্ত কোনো অর্থ ব্যয় করতে হয়নি। কারণ নিজের গাছ থেকে কলম করে চারা বানিয়েছেন। ফলে চারা কিনতে হয়নি। জমি তো ছিলোই।

'৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারের জন্যে তিনি হঠাৎ করেই মনোনীত হন। তার জীবনে এটা অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। পত্র-পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হবার পর তার জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। রঘুরামপুরবাসীর জীবনে তিনি হয়ে ওঠেন সুপার মডেল। গ্রামের অন্যরাও তার পথ ধরলেন। হিংসায় পিছিয়ে গেলেন না বরং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন সবার দিকে। ফলে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ইব্রাহীম সরকারের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে ৮/১০টি লেবুর বাগান তৈরি হলো। সকল চারা গেলো ইব্রাহীম সরকারের বাগান থেকে। তার লেবু বাণিজ্যে এতে নতুন মাত্রা যোগ হয়। তিনি বলেন, 'আমার বাড়িতে যারাই বাগান দেখতে এসেছে, তাদের আমি দুটো করে চারা ফ্রি দিয়েছি। সবাইকে বলেছি এই চাষটা লাভজনক। এটা করো। বঙ্গবন্ধু পুরস্কার পাওয়ার পর আশপাশের অনেকেই খবর নিতে শুরু করলো। সবাই বাগান করতে চায়। সবাইকে সাহায্য করতে হবে। কাউকে ফেরাইনি। চারা বিক্রি শুরু করলাম। কাটিং (লেবুর ডালের লম্বা অংশ) বিক্রি হলো। কেউ কাটিং করতে পারে না। আবার আমার বাগান ছাড়া উপায় নেই। তখন বুঝলাম সুন্দর দিন সামনে অপেক্ষা করছে। লেবু গাছের সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। লেবু, চারা কাটিং সব কিছুই বিক্রয়যোগ্য। আবার লেবু গাছ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পাতা জমিতে পড়ে সার হয়। সব মিলিয়ে লাভের পাল্লাই ভারী। লোকজনকে সাহায্য করলে দু'জনেরই লাভ- এ ভাবনা থেকেই সকলের পাশে দাঁড়িয়েছি। অন্যরাও আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।'

সফলতা যখন আসে, চারদিক থেকেই আসে। ইব্রাহীম সরকারের জীবনে কথাটা আরও বড় সত্য। যিনি ছিলেন অখ্যাত এক গ্রামের মডেল, তিনিই এক সময় সারা দেশের মডেল হয়ে গেলেন। দেশের বিখ্যাত সব ব্যক্তি তার বাড়িতে ভিড় জমাতে থাকলেন। তাদের টাকা আছে, জমি আছে, বাগান করবেন। কিন্তু তারা চাষের পদ্ধতি জানেন না। দেশে কোথাও এই জাতের চারা নেই। কি আর করা, নিজের লাভের কথা ভেবেই তিনি চাষের পরিধি যেমন বাড়ালেন, তেমনি বাগানের আয়ুষ্কাল কমিয়ে, নতুন নতুন বাগানের দিকে ঝুঁকলেন। লেবুগাছ দীর্ঘদিন বাঁচে। কিন্তু তিনি ৬/৭ বছরের বেশি গাছ রাখেন না। কারণ কাটিংয়ের চাহিদা মেটাতে হিমশিম অবস্থা তার। ফলে কিছুটা পুরনো হলে পুরো বাগানেই তিনি কাটিং করেন। অর্থাৎ একদিকে রোপণ করেন, অন্যদিকে কাটেন। তার চারার ওপর নির্ভর করে বা তার দেখাদেখি সারা দেশে ২২৩টি লেবুর বাগান হয়েছে। বিদেশীরাও তার চাষ করা জাতকে নিজ দেশে নিয়ে গেছে। এর মধ্যে নেপালে ২টি, আমেরিকায় ৭টি, ইংল্যান্ডে ৩টি চারা গেছে বলে তিনি মনে করতে পারেন। অনেক বিদেশী তার বাগান ঘুরে নিজ দেশে বাগান করার আগ্রহ দেখাচ্ছেন বলে জানালেন তিনি। 'সাফল্য একার নয়, সবার। আমি একা ভিটামিন সি খেতে চাই না। সারা দেশে আমার দেখাদেখি লেবুর বাগান হচ্ছে। প্রতিবছর চারার চাহিদা বাড়ছে। আমি একা পেরে উঠে না। অন্য যারা আমার সাহায্যে বাগান করেছে, তাদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে সারা দেশে চারা আর কাটিংয়ের চাহিদা মিটাচ্ছি। বিদেশীরাও আসছে। আমার এই সাফল্য তো সারা দেশের মানুষের। প্রচুর বাগান করতে পারলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে লেবু বিদেশেও পাঠাতে পারবো। বিদেশী অর্থ আসবে। সুতরাং সব কৃষকের লেবুর চাষ করা উচিত। বিদেশীরা আমাকে বলেছে তাদের দেশে লেবুর প্রচুর চাহিদা। তাছাড়া এত সুন্দর লেবু সোনার বাংলা ছাড়া আর কোথায় হবে?'- বললেন তিনি। তিনি সাফল্য ভাগ করতে চান বলেই সফলতা তার পেছনে ঘোরে- এই মন্তব্য গ্রামবাসীর।

কম বিনিয়োগে বেশি লাভ

সবাই চায় অল্প বিনিয়োগে বেশি লাভ। লেবু চাষের ক্ষেত্রে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত। আপনার ১/২ বিঘা জমি থাকলেই শুরু করতে পারেন। এক বিঘায় প্রায় ১৪ শ' গাছ রোপণ করা সম্ভব। এলাকা বিশেষে চারার মূল্য কম হয় বেশি ইব্রাহীম সরকার প্রতিটি চারা বিক্রি করেন ১০ টাকায়। কাটিং ৭০ পয়সা। কাটিং বেশি নিলে অবশ্য মূল্য আরও কমে যায়। ইব্রাহীম সরকার বলেন, প্রথম বছর এক একটা চারার গোড়ায় এক মুঠো গোবর দিয়ে রোপণ করার পর অল্প কিছু টিএসপি, পটাশ, ইউরিয়া লাগবে। গাছ বড় হলে ঠেকা দেবার জন্য ছোট ছোট বাঁশের খুঁটি এবং জমিতে যাতে আগাছা না জন্মে সে জন্যে খুব অল্প বিস্তর কামলা দরকার হবে। আমরা হিসেব করে দেখেছি প্রথম বছরে গাছ প্রতি ২৫ টাকার মতো খরচ হয়। পরের বছর থেকে খরচ কমতেই থাকবে। লেবু ধরার পর থেকে শুধু আয় বাড়বে

আর খরচ কমবে।'

চারা রোপণের এক বছরের মাথায় লেবু আসে। তারপর থেকে ১২ মাসই লেবু পাওয়া যায়। দেশী প্রজাতির এই লেবুর ঘ্রাণ যেমন অসাধারণ তেমনি লাভবান প্রজাতি। জমিতে যদি অনেক ফাঁকা করে গাছ লাগান তবে বছরে গাছ প্রতি ১২/১৫ শ' লেবু পাবেন। ঘন হলে ৭/৮ শ' এই হিসাব ইব্রাহীম সরকারের। সাপ্তাহিক ২০০০ হিসাবে করে দেখেছে এক বিঘা জমিতে ১৪ শ' গাছের বাগান করলে সব খরচ বাদ দিয়ে আয় হয় ৭০ হাজার টাকা। এটা শুধু লেবুর দাম। এরপর কাটিংয়ের হিসাব বাদ। যতদিন গাছ একবারে কেটে না ফেলছেন ততদিন ফলন হতেই থাকবে। সময় মতো যত ডালপালা ছেঁটে দেয়া যাবে তত লাভ। কারণ একটা ডাল কাটলে সেখান থেকে ৫টা বেরোবে। এতে লেবু আসবে বেশি। আবার কাটিংও পাওয়া যাবে বেশি।

ইব্রাহীম সরকার এ বছর সাড়ে ৬ হাজার চারার অর্ডার পেয়েছেন। ব্র্যাক তার কাছ থেকে এ বছর ৫৫ পয়সা দরে ১০/১২ লাখ কাটিং কিনবে। এর আর্থিক মূল্য হিসাব করলে দেখা যায়, তিনি শুধু এ বছর চারা আর কাটিং বিক্রি করে ১০ লাখ টাকার ওপর আয় করবেন। আর বেপারীরা প্রতিদিন নগদ টাকায় তার বাড়ি এসে লেবু কিনে নিয়ে যাচ্ছে। পাইকারী ১০০ টাকা শ' দরে তিনি লেবু বিক্রি করছেন বর্তমানে। তিনি বলেন, 'বর্তমানে আমার মাসিক আয় শুধু লেবু থেকে আসে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। এর মধ্যে শ্রমিকদের বেতন বাবদ ২০ হাজার টাকা চলে যায়। বাকি টাকায় সংসার চলে। পানি ছাড়া সব কিনে খাই। কোনো অভাব নাই। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে খুব সুখী মানুষ আমি। এছাড়া সিজনে চারা আর কাটিং বিক্রির টাকা তো আছেই।'

তার হিসাবে বর্তমানে বাগানের জমির পরিমাণ ৬ একরের একটু কম। আমাদের হিসাবে আরও কম। তিনি আয়ের যে হিসাব দেখিয়েছেন, তার বাগান ঘুরে সাপ্তাহিক ২০০০-এর মনে হয়েছে মাসিক আয় তার আরও বেশি। তিনি যেহেতু কোনো হিসাবে রাখেন না তাই নির্দিষ্ট অঙ্ক নিয়ে তার সমস্যা আছে। একথা তিনিও স্বীকার করলেন। তিনি বলেন, 'বিনিয়োগের তুলনায় লাভ অনেক বেশি। কিন্তু আমি বাবা কোনো হিসাব রাখি না। প্রয়োজনও মনে করি না। চাষটাতে পরিশ্রম কম, বিনিয়োগ কম। সুতরাং এত হিসাব রেখে কি হবে? সংসার চলে যাচ্ছে। সবাই ভালো আছে। এতেই আমি খুশি।'

ভালো চাষী ভালো মানুষ

ইব্রাহীম সরকার শুধু ভালো চাষী নন, ভালো মানুষও বটে। তার বাগানের কোথাও ঘেরা নেই। তার গাছের লেবুতে কেউ হাত দেয়া না। কারণ কি? উত্তরে তিনি বলেন, 'গ্রামের সকলকে বলেছি যার যতটুকু প্রয়োজন সে ততটা লেবু যেন তুলে নেয়। আমাকে জিজ্ঞাসা করারও দরকার নেই। একটাই অনুরোধ, কেউ যেন, প্রয়োজনের বেশি একটি লেবুও না তোলে। তুললে অতিরিক্ত লেবুর ওপর আমার দাবি থাকবে। তাই কেউ আমার ক্ষতি করে না। আবার কারোর বাড়ির অনুষ্ঠানে যত লেবুই দরকার হোক, তা সে দেশের যে প্রান্তেরই লোক হোক না কেন, আমি কোনো টাকা নিই না। নিজের সাধ্যমতো সবার সাহায্য-সহযোগিতা করি। তাই সম্ভবত ক্ষতি করার কথা কেউ ভাবেও না। সবার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছি বলে আমি গ্রামের সম্মানিতদের একজন। কয়েক দিন আগেও কৃষিমন্ত্রীর আসার কথা ছিলো তার বাড়িতে। ভালো চাষীর স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ময়মনসিংহ জেলা কৃষি ঋণ বিতরণ কমিটির সদস্য হয়েছেন। তার বাড়িতে বসেই সরকারের লোকেরা কৃষি ঋণ বিতরণ করেন। তিনি বলেন, 'শুধু ভালো চাষ করার জন্য আমার মতো মূর্খ মানুষ ডিসি সাহেবের সঙ্গে বসে মিটিং করতে পেরেছি। অন্য কৃষকদের সাহায্যে আসতে পেরেছি। আমি খুবই আনন্দিত। আমি মনে করি ভালো চাষী না, ভালো মানুষ হওয়াও দরকার। যাতে দেশের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে কিছু করা যায়।' খুবই সত্য কথা। ইব্রাহীম সরকারের মতো রাজনীতিবিদরা যদি ভাবতো তবে বাংলাদেশ সত্যিই সোনার বাংলায় পরিণত হতো। এ উপলব্ধি পুরো জাতির।

কৃষিই বদলে দিতে পারে দেশ

সত্যিকার সুযোগ আর পৃষ্ঠপোষকতা পেলে কৃষিই বদলে দিতে পারে দেশ। আগের দু'সংখ্যায় আমরা অন্য দুটি গ্রামের কৃষকদের কথা বলেছি। সারা দেশের কৃষির আসলে একই রকম সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু এটাকে বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। ইব্রাহীম সরকার জানিয়েছেন, শুধু ময়মনসিংহে প্রতিদিন এক ট্রাক লেবুর চাহিদা রয়েছে। বছরে চারার চাহিদা কয়েক লাখ। যা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের চাষীরা পূরণ করছে। প্রতিবছর এই চাহিদা বাড়ছে। তাই বিদেশী স্বাদহীন লেবু বাদ দিয়ে ১২ মাস পাওয়া যায় দেশী এই লেবু চাষই কি লাভজনক নয়? শুধু লেবু চাষ করে মাত্র ৮ বছরে ইব্রাহীম সরকার লাখ লাখ টাকা উপার্জন করেছেন। আগামী বছর একটা ট্রাক কেনার ইচ্ছা তার। এই ট্রাকে করে নিজ ক্ষেতের লেবু শহুরে বাবুদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। এর ফাঁকে ট্রাক দিয়ে বাড়তি উপার্জন তো আছেই। শুধু কৃষি দিয়েই একজন ফুটবলার জীবন বদলে ফেলেছেন। যে কথা তিনিও গর্বের সঙ্গে বলেন।

গরিবের উপকারের জন্য মাঠে একটা শ্যালো মেশিন বসিয়েছেন। সেখান থেকে তিনি খুব কম অর্থ নেন। বাগান আর বাড়ানোর ইচ্ছা নেই তার। তিনি বলেন, 'যা আছে তাই রাখবো। কাটিংটাকে প্রধান ব্যবসা হিসেবে নেবো। প্রতিবছর চারা আর কাটিং করবো। চারা, কাটিং বিক্রি হলে সেখানে নতুন বাগান করবো। পরের বছর অন্য বাগান কাটবো। জায়গা আর বাড়াবো না। বয়স হয়েছে। ভবিষ্যতে ছেলেরা যদি করে করবে।'

ইব্রাহীম সরকারের মতো নাম না জানা হাজার মডেল এই বাংলাদেশেই রয়েছে। তাদের জন্য সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা আর বিকাশের সুযোগ দিলে তারাই বদলে দেবে দেশ। ইব্রাহীম সরকারও আমাদের সে কথাই শোনালেন। আসার আগে বললেন, 'আসুন না মারামারি কাটাকাটি বাদ দিয়ে, লাভজনক এসব চাষে মনোযোগ দিই। দেশ তো সবার। কৃষকের একার কি দায়িত্ব দেশ বাঁচানোর?'

প্রশ্নটি আমারও। আমার মতো আরো কোটি কোটি সাধারণ বাংলাদেশীর। কিন্তু যাদের দায়িত্ব উত্তর দেবার তারা কি কখনো দেশ নিয়ে ভাবেন? ভাববার সময় কি আছে? তারা তো শুধুই ব্যস্ত নিজেদের লাভ-ক্ষতির হিসাব মিলানোতে।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**